ইউনিট ২৫

মৎস্য আইন ও প্রয়োগ

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় আমিষের চাহিদা পূরণে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এবং সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা, প্রাপ্যতা, সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার কতিপয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। মৎস্য আইন হলো এমন একটি নীতিমালা যা বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন হবে এবং প্রাণিকূলে মাছের বৃদ্ধিসহ পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকবে। মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ, নির্বিচারে পোনা মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ নিধণ মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির পথে বড় অন্তরায়। এ কারণে আমাদের দেশে মৎস্য সম্পদ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। মাছের বিলুপ্তি রোধকরণ, নিয়মমাফিক মৎস্য আহরণ, প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষাকরণ সর্বোপরি পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার করার জন্য মৎস্য আইন অতি জরুরী। বাংলাদেশের নদ-নদী, মোহনা ও বঙ্গোপসাগর হতে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রেও মৎস্য আইন তথা আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে ধারনা থাকা প্রয়োজন।

এ ইউনিটে মৎস্য আইন সমূহের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশের বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইন এবং এর প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতা, সামুদ্রিক মৎস্য আইন ১৯৮৩, আন্তর্জাতিক আইন ও তার প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ২৫.১

মৎস্য আইন সমূহের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৎস্য আইন কেন প্রচলন করা হয়েছে তা জানতে পারবেন।
- মৎস্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই মৎস্য আইন প্রবর্তন ও প্রচলন করা হয়েছে যদিও বাস্তবে এসব আইন প্রয়োগ করতে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ, আহরণ ও সঠিক ব্যবহারের জন্য যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক।

এই আইন বাস্তবায়নের ফলে-

- মৎস্য প্রজাতির বংশ টিকে থাকবে।
- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- বিলুপ্ত বা প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতি টিকে থাকবে।
- সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা হবে।
- পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।
- অপরিকল্পিতভাবে আহরণ, বিতরণ ও বিপণন বন্ধ হবে।
- মৎস্য কুলের স্বাভাবিক প্রজনন বজায় থাকবে।
- কারেন্ট জালের ব্যবহার বন্ধ হবে।
- নিয়মমাফিক মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হবে।
- মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনে পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন ক্ষতিকারক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ হবে।

মৎস্য আইনের উদ্দেশ্য

- সন্তোষজনক হারে মাছ আহরণ করা।
- ছোট মাছকে বড় হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।
- প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম মাছের আহরণ বন্ধ করা।
- বয়স্ক বা বড় মাছগুলোকে জলাশয় থেকে সরিয়ে নেয়া।
- মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল, বিচরণক্ষেত্র এবং প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা।
- অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ বন্ধ করা।
- ডিম, ডিমপোনা, রেণুপোনা, ধানীপোনা ও নির্দিষ্ট আকারের নিচের ছোট মাছ আহরণ বন্ধ করা।

- পরিবেশ ও মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকর মাছ ধরার সরঞ্জাম ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার বন্ধ করা।
- আহরিত মাছের গুনগত মান গ্রহনযোগ্য পর্যায়ে রাখা।
- মাছ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রতিটি ধাপে হ্যাসাপ পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- চাষযোগ্য জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আনা।
- জলাশয় মালিকদের মাছ চাষে আগ্রহী করে তোলা।
- মৎস্যচাষীদের সচেতন এবং দায়িত্ত্বশীল হিসেবে গড়ে তোলা।
- মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

মৎস্য আইনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক ও সমুদ্রকূলবর্তী কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য খাতটি আবহমান কাল হতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু প্রাকৃতিক এবং মানুষ দ্বারা সৃষ্ট কতিপয় কারণ মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের প্রধান অন্তরায়। ফলে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। তাই মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, ভবিষ্যৎ চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের বিষয়কে বিবেচনা করে মৎস্য বিষয়ক কতিপয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ও মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারনে মাছের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। জলাশয় থেকে অধিক মাত্রায় মৎস্য আহরণ এবং অপরিকল্পিত ভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ নির্মাণের ফলে মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে। প্রজনন মৌসুমে অবাধে ডিমওয়ালা মাছ, ডিম পোনা, ধানী পোনা, রেণু পোনা নিধন, কারেন্ট জালের ব্যবহার, কীটনাশক প্রয়োগের কারণে বর্তমানে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রজনন মৌসুমে অবাধে ডিমওয়ালা মাছ, ডিম পোনা, ধানী পোনা, রেণু পোনা নিধন, কারেন্ট জালের ব্যবহার, কীটনাশক প্রয়োগের কারণে বর্তমানে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

মৎস্য আইনের প্রয়োজনীয়তার প্রধান বিষয় সমূহ

- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- সর্বোচ্চ সহনশীল পরিমান মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা করা।
- প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা।
- মৎস্য রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা।
- বিপন্ন প্রায় প্রজাতিকে রক্ষা করা।
- প্রজননকালে স্ত্রী মাছকে রক্ষা করা যাতে পর্যাপ্ত পোনা মাছ উৎপাদন হতে পারে।
- ডিম পোনা, রেণু পোনা এবং ধানী পোনার আহরণ বন্ধ করা।
- নির্বিচারে ছোট মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন বন্ধ করা।
- মাছের প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ করা।
- মাছের অভয়াশ্রম সংরক্ষণ করা।
- মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ বন্ধ করা।
- অব্যবহৃত বা চাষযোগ্য জলাশয় চাষের আওতায় আনা।
- শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য জলাশয়ে নি:সরন বন্ধ করা।
- লাইসেন্স বিহীন ট্রলার দ্বারা মাছ আহরণ বন্ধ করা।

- সামুদ্রিক জলাশয়ে অবৈধভাবে বিদেশী ট্রলারের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।
- মাছের গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

অনুশীলনী (Activity) ঃ মৎস্য আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট মতামত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করুন।

সারমর্মঃ

জাতীয় অর্থনীতিতে আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন সর্বোপরি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ, নির্বিচারে পোনা মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির পথে বড় অন্তরায়। এ কারনে আমাদের দেশে মৎস্য সম্পদ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। তাই মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, ভবিষ্যৎ চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মৎস্য আইন বাস্তবায়ন হলে-
ক) বিলুপ্ত প্রজাতির মাছ টিকে থাকবে না
খ) কারেন্ট জালের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে
গ) মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ব্যহত হবে
ঘ) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে

২। মৎস্য আইনের উদ্দেশ্য নয় কোন্টি?
ক) পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে
খ) অতিরিক্ত মৎস্য আহরন বন্ধ করা
গ) বিস্ফোরক এবং বিষ দিয়ে মাছ আহরন বন্ধ করা
ঘ) ছোট মাছ না ধরা

৩। প্রাণীজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ আসে কোন উৎস থেকে?
ক) পোল্ট্রি খ) দুধ
গ) মাছ ঘ) উপরের কোনটিই নয়

৪। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সেক্টরের সাথে জড়িত?
ক) গার্মেন্টস খ) কৃষি
গ) প্রাণীসম্পদ ঘ) মৎস্য

উত্তরমালাঃ ১।ঘ ২।ক ৩।গ ৪।ঘ

পাঠ ২৫.২

বাংলাদেশে বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইন এবং এর প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৎস্য সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বর্তমান মৎস্য সংরক্ষণ আইনের বৈশিষ্ট্য কী কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ জলসম্পদ ও প্রাণিবৈচিত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি, ডোবা-নালা, হাওড়-বাওড় ও প্লাবনভূমি। এছাড়াও রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি। মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ উন্নয়নের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০

দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিশ এ্যাক্ট- ১৯৫০, সাধারণভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ নামে পরিচিত। নির্বিচারে পোনা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছ নিধন মৎস্য সম্পদের বৃদ্ধিতে প্রধান অন্তরায়। এ সমস্যা দূরীকরনে সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে এ আইন প্রনয়ন করে। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

> বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ ধরা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

১. এ আইনে মাছ বলতে সকল কার্টিলেজিনাস, জেলি ফিশ, প্রন, শ্রিম্প, এমফিবিয়ানস, টরটয়েজ, টারটলস, ক্রাস্টাসিয়ান, এ্যানিম্যালস, মোলাস্কস এবং ইকাইনোডার্ম এর জীবনচক্রের সকল ধাপকে বুঝাবে।

২. এ আইনে ফিশারি বলতে সকল প্রকার জলাশয়, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, মুক্ত বা আবদ্ধ, স্রোতশ্বী বা স্থির, যেখানে মাছ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, প্রজনন, আহরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড জড়িত; তবে কৃত্রিম অ্যাকুরিয়াম উক্ত আইনের আওতাভূক্ত হবে না।

> মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে কম ব্যা বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৩. নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরণ করা যাবে না; এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপনা সীজ, অপসারণ বা বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

৪. জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যাতিত নদী-নালা, খাল এবং বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ বা কোনরূপ অবকাঠামো গ্রহণ করা যাবে না।

৫. অভ্যন্তরীণ বা উপকূলীয় জলাভূমিতে বন্দুক বা তীর ধনুক ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৬. অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্য কোন উপায়ে মাছ ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ মারা যাবে না।

৭. মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

২৩ সে.মি. বা ৯ ইঞ্চির নিচের আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউস, ঘনিয়া, ইলিশ, পাঙ্গাস মাছ ধরা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

৮. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক -
ক) প্রতি বছর জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চি) এর ছোট আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউস, ঘনিয়া;
খ) প্রতি বছর নভেম্বর হতে মে (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জ্যৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চি) এর ছোট আকারের ইলিশ (যা জাটকা নামে পরিচিত);
গ) প্রতি বছর নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সে.মি. (১২ ইঞ্চি) এর ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইর মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

২৩ সে.মি. বা ৯ ইঞ্চির নিচের আকারের ইলিশ মাছকে জাটকা বলে।

৯. চাষের উদ্দেশ্যে মাছ ধরার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে (বর্তমানে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা) নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হলে বিধিবদ্ধ ২৭টি নদী, খাল ইত্যাদিতে নির্ধারিত সময়ে যে কোন আকারের রুই, মৃগেল, কাতলা, কালবাউস এবং ঘনিয়া আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

১০. চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারনভাবে নদী-নালা, খাল-বিলে সুযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতি বছর ১ এপ্রিল থেকে ৩১ আগষ্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক বা দম্পতি মাছ ধ্বংস ও ধ্বংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

১১. বাজেয়াপ্তকৃত মাছ নিলামে বিক্রয় করা যাবে।

১২. উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ বা চিংড়ি পোনা আহরণ নিষিদ্ধ।

১৩. জীবিত বা মৃত ব্যাঙ ধরা বা বহন করা পরিবহন করা বা এখতিয়ারে রাখা নিষিদ্ধ।

সরকার ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ইলিশ মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৪. ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ

সরকার ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর ১০০ কিলোমিটার এলাকা, ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত মেঘনার শাহবাজপুর শাখা নদীর ৯০ কিলোমিটার, ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত তেঁতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকা এবং প্রতি বছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিলোমিটার এলাকার কোন ব্যক্তি কোন মাছ ধরতে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করতে পারবে না।

১৫. ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ

ইলিশ মাছ অবাধ প্রজননের সুযোগ দেয়ার জন্য প্রতি বছর ১৫-২৪ অক্টোবর (১-১০ আশ্বিন) ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের সুযোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার শাহেরখালী/ হাইতকান্দি পয়েন্ট, ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার উত্তর তজুমুদ্দিন/ পশ্চিম সৈয়দ আওলিয়া পয়েন্ট, কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া/ গন্ডামারা পয়েন্ট এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপালি পয়েন্ট সমূহের অন্তর্গত প্রায় ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রজনন ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১৫-২৪ অক্টোবর (১-১০ আশ্বিন) ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

১৬. মৎস্য অফিসার বা পুলিশ অফিসার (সাব ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নহে) এর অভিযোগ বা রিপোর্টের ভিত্তিতে মৎস্য আইন ভঙ্গ করা আমলযোগ্য অপরাধ (কগনিজিবল অফেন্স)।

১৭. শাস্তি

ক) প্রথমবার আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ১০০০/- টাকা জরিমানা।

খ) পরবর্তিতে প্রতিবার আইন ভঙ্গের জন্য কমপক্ষে ২ মাস হতে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০/- টাকা জরিমানা।

১৮. এ আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

১৯. আইন ভঙ্গকারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ওয়ারেন্টে এ্যারেষ্ট করা যাবে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতা

সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণ, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ, উপযুক্ত ব্যবহার এবং মান সম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করার জন্য অনেক যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে এ আইন কার্যকর করা যাচ্ছে না। কারণগুলো হলো-

১. জনসংখ্যার আধিক্য, জেলেদের নিম্নমানের সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থা।

২. জেলেদের বিকল্প আয়ের উৎসের অভাব এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।

৩. আবহমান কাল থেকে জলসম্পদের ওপর জনগনের সহজাত প্রবৃত্তি, ত্রুটিপূর্ণ ইজারা ব্যবস্থা, যৌথ মালিকানা, একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জলাশয় নিয়ন্ত্রণ আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের বাস্তব প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

৪. জলমহলের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালার অভাব।

৫. মৎস্য সেক্টরের সাথে দেশের বিভিন্ন সেক্টরের সমন্বয়হীনতার অভাব।

৬. মৎস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সীমিত জনবল ও আইন প্রয়োগের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাবে প্রচলিত মৎস্য আইন সমূহের সুষ্ঠ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তবুও এসব আইন ভঙ্গের কারণে প্রতি বছর সরকার কর্তৃক অনেক মামলা দায়ের করা হচ্ছে। মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব যথাযথভাবে বিবেচনা করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সময়োপযোগী মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে মৎস্য সংরক্ষণ আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) ঃ আপনার এলাকায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ ভঙ্গকারী যে সকল কর্মকান্ড বিদ্যমান সেগুলো লিখুন এবং মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট মতামত যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করুন।

সারমর্মঃ

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা, প্রাপ্যতা, সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য সময়োপযোগী মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণ করা, মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা মৎস্য আইনের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যেই **১৯৫০** সালে প্রথম মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো মাছ ধরার জালের ক্ষেত্রে ৪.৫ সে.মি. বা তদাপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট জাল এর ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং ২৩ সে.মি. বা ৯ ইঞ্চি এর নিচের আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, ঘনিয়া, কালবাউস, ইলিশ ও ডিমওয়ালা মাছ ধরা, পরিবহন করা ও বিক্রি করা নিষিদ্ধ। সরকার ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ইলিশ মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রথম কত সালে প্রণয়ন করা হয়েছে?
ক) ১৯৩৯ (খ) ১৯৫০
গ) ১৯৬৩ (ঘ) ১৯৮৩

২। মাছ ধরার ক্ষেত্রে কত সে.মি. এর কম ব্যাস বিশিষ্ট ফাঁস জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ?
ক) ২.৫ (খ) ৩.৫
গ) ৪.৫ (ঘ) ৫.৫

৩। সরকার ঘোষিত ইলিশ মাছের অভয়াশ্রম এলাকা কয়টি?
ক) ৩ টি (খ) ৪ টি
গ) ৫ টি (ঘ) ৬ টি

৪। কত সে.মি. এর নিচের আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউস, ঘনিয়া ধরা আইনত: দন্ডনীয় অপরাধ?
ক) ৯ সে.মি. খ) ১২ সে.মি.
গ) ২৩ সে.মি. ঘ) ৩০ সে.মি.

উত্তরমালাঃ **১।খ ২।গ ৩।খ ৪।গ**

পাঠ ২৫.৩

সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ১৯৮৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সামুদ্রিক মৎস্য আইন কেন প্রণয়ন করা হয়েছে তা জানতে পারবেন।
- সামুদ্রিক মৎস্য আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার “দি মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩” (অর্ডিন্যান্স নং ৩৫, ১৯৮৩) জারি করেন এবং তদাধীনে “দি মেরিন ফিশারিজ রুলস, ১৯৮৩” প্রণয়ন করেন। ইহা সাধারনভাবে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ১৯৮৩ নামে পরিচিত। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

প্রতিটি মৎস্য নৌযান (ট্রলার এবং যান্ত্রিক নৌকা) এর জন্য নির্ধারিত ফি (সর্বনিম্ন ৭৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত) প্রদান সাপেক্ষে বাৎসরিক ফিশিং লাইসেন্স (জানুয়ারি-ডিসেম্বর মেয়াদে) গ্রহণ বাধ্যতামূলক।

১. প্রতিটি মৎস্য নৌযান (ট্রলার এবং যান্ত্রিক নৌকা) এর জন্য নির্ধারিত ফি (সর্বনিম্ন ৭৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত) প্রদান সাপেক্ষে বাৎসরিক ফিশিং লাইসেন্স (জানুয়ারি-ডিসেম্বর মেয়াদে) গ্রহণ বাধ্যতামূলক।
২. লাইসেন্সধারীর জন্য আহরণকৃত ও মৎস্য সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক।
৩. বিপদগ্রস্ত বা আইনানুগ প্রয়োজন ব্যতিত বাংলাদেশের জলসীমায় কোন বিদেশী মৎস্য নৌযানের আগমন নিষিদ্ধ।
৪. অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশী মৎস্য নৌযান বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।
৫. অথরাইজড অফিসার মৎস্য নৌযান থামানো, পরীক্ষা করা, অঙ্গনে প্রবেশ করা, নৌযান বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।
৬. বাজেয়াপ্তকৃত নৌযান ও নাবিকগণকে নিকটবর্তী বন্দরে নেয়া যাবে।

বিপদগ্রস্ত বা আইনানুগ প্রয়োজন ব্যতিত বাংলাদেশের জলসীমায় কোন বিদেশী মৎস্য নৌযানের আগমন নিষিদ্ধ।

৭. বাজেয়াপ্ত নৌযান উহার সমুদয় আনুষঙ্গিকসহ সরকার কতৃক নিষ্পত্তিযোগ্য।
৮. অধ্যাদেশের ধারা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিনা ওয়ারেন্টে আটককৃত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী থানায় হস্তান্তর করতে হবে।
৯. জব্দকৃত পঁচনশীল দ্রব্যাদি বিক্রয়যোগ্য।
১০. অথরাইজড অফিসার বা তার অনুগামী কর্তৃক অধ্যাদেশের বা তদাধীনে প্রনীত বিধানবলী প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে গৃহীত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।
১১. ব্যবহৃত ফাঁস জালের আকার হবে-

ক) চিংড়ি ধরার ট্রল নেটের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার।

খ) মাছ ধরার ট্রল নেটের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৬০ মিলিমিটার।

মাছ ধরার ট্রল নেটের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৬০ মিলিমিটার।

গ) বড় ফাঁসযুক্ত ভাসাল জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ২০০ মিলিমিটার।
ঘ) ছোট ফাঁসযুক্ত ভাসাল জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ১০০ মিলিমিটার।
ঙ) বেহুন্দি জালের কড প্রান্তে জালের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার।

১২. মৎস্য আহরণ এলাকা-
ক) সর্বোচ্চ জোয়ারে বেহুন্দি জাল, বড়শী, ছোট ও বড় ফাঁসের ভাসাল জাল ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মৎস্য আহরণ এলাকা সীমাবদ্ধ এবং
খ) সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার গভীরতার বাইরে ট্রলার দ্বারা মৎস্য/চিংড়ি আহরণ এলাকা নির্ধারিত।

বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার এবং বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়ায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ।

১৩. যে সব পদ্ধতিতে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ-
ক) বিধিবদ্ধ বিনির্দেশ এর কম ফাঁস বিশিষ্ট জালের ব্যবহার
খ) বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার
গ) যে কোন সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণের জন্য বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

১৪. বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণের জন্য
ক) ফিশিং লাইসেন্স
খ) প্রয়োজনীয় সনদপত্র
গ) জাতীয়তা প্রদর্শনকারী পতাকা ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিচিতি চিহ্ন এবং
ঘ) সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে নিয়োজিত প্রত্যেকের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক জারীকৃত পরিচয়পত্র প্রয়োজন।

১৫. সরকার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে বঙ্গোপসাগরের ৪টি মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের ২টিতে (মিডল গ্রাউন্ড এবং সাউথ প্যাচেস) ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (মেরিন রিজার্ভ) হিসেবে ঘোষনা করেছে।

১৬. বাংলাদেশের সামুদ্রিক উপকূলীয় জলসীমা এবং মোহনায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা ও অন্যান্য প্রজাতির যে কোন ধরনের মৎস্য পোনা আহরণ ও নিধন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে।

১৭. লাইসেন্সকৃত মৎস্য নৌযান জাহাজ চলাচল পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

১৮. চিংড়ি ট্রলারের জন্য ৩০% সাদা মাছ আহরণ ও অবতরণ বাধ্যতামূলক।

১৯. সামুদ্রিক মৎস্য সারভেইলেন্স চেক পোষ্ট বা অন্যত্র অবস্থানরত অথরাইজড অফিসারের নির্দেশে সাড়া দেয়া প্রতিটি মৎস্য নৌযানের জন্য বাধ্যতামূলক।

২০. সামুদ্রিক আইনের বিধানাবলীর লংঘনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে নৌযান বাজেয়াপ্তকরণ, জরিমানা ও বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রয়েছে।

সারমর্মঃ

বাংলাদেশের বিশাল সামুদ্রিক জলসম্পদ থাকা সত্তেও দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ আসে এ ক্ষেত্র থেকে। দেশের সমুদ্রসীমায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য "দি মেরিন ফিশারিজ রুলস, ১৯৮৩" প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো সমুদ্রসীমায় মাছ ধরার ট্রলারের জালের কড প্রান্তের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৬০ মিলিমিটার, চিংড়ি ধরার ট্রলারের জালের কড প্রান্তের ফাঁসের আকার হবে কমপক্ষে ৪৫ মিলিমিটার, সর্বোচ্চ জোয়ারে জাল ও বড়শি দ্বারা মাছ ধরার সীমাবদ্ধ এলাকার সর্বোচ্চ গভীরতা ৪০ মিটার, বিস্ফোরক, বিষ এবং অন্যান্য অবশকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার করে মাছ আহরণ সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাছ ধরার ট্রলারের জালের কড প্রান্তের ফাঁসের আকার কমপক্ষে কত হওয়া উচিৎ?
ক) ৫০ মি.মি.
খ) ৬০ মি.মি.
গ) ৭০ মি.মি.
ঘ) ৮০ মি.মি.

২। বঙ্গোপসাগরে মৎস্য চারণ এলাকা কয়টি?
ক) ৩ টি
খ) ৪ টি
গ) ৫ টি
ঘ) ৬ টি

৩। সর্বোচ্চ জোয়ারে জাল ও বড়শি দ্বারা মাছ ধরার সীমাবদ্ধ এলাকার সর্বোচ্চ গভীরতা কত?
ক) ৩০ মিটার
খ) ৪০ মিটার
গ) ৫০ মিটার
ঘ) ৬০ মিটার

৪। চিংড়ি ধরার ক্ষেত্রে ট্রল নেটের কড প্রান্তের ফাঁসের আকার কমপক্ষে কত হতে হবে?
ক) ২৫ মি.মি.
খ) ৩৫ মি.মি.
গ) ৪৫ মি.মি.
ঘ) ৫৫ মি.মি.

উত্তরমালাঃ **১। খ ২। খ ৩। খ ৪। গ**

পাঠ ২৫.৪

আন্তর্জাতিক আইন ও তার প্রয়োগ বিধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের আন্তর্জাতিক আইনসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আন্তর্জাতিক আইনসমুহের প্রয়োগবিধি বর্ণনা করতে পারবেন।

একান্ত অর্থনৈতিক এলাকাসহ বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলাশয়ের পরিমান প্রায় ১৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এ ছাড়া সম্প্রতি মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির ফলে নতুন ১, ১১, ৬৩১ ব.কি.মি. সামুদ্রিক জলসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের মাত্র ১৯.০৩ শতাংশ (২০০৮-০৯) আসে এ বিশাল সামুদ্রিক জলসম্পদ থেকে। অপরদিকে, বাংলাদেশে নদী ও মোহনাঞ্চল, সুন্দরবন, বিল, হাওড়, কাপ্তাই হ্রদ ও প্লাবনভূমি সহ প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর মুক্ত জলাশয় রয়েছে। মোট মৎস্য উৎপাদনের ৪১.৬১ শতাংশ আসে এ ক্ষেত্র থেকে। এ সমস্ত নদ নদীর অনেকগুলোই (৫৪টি) আন্তর্জাতিক অর্থ্যাৎ হিমালয় পর্বত হতে উৎপন্ন হয়ে ভারত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পরিবেশগত দিক থেকে সকল পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং পানির দূষণ পরিহার করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারে নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

দেশের মোট মৎস্য সম্পদের মাত্র ১৯.০৩ শতাংশ (২০০৮-০৯) আসে বিশাল সামুদ্রিক জলসম্পদ থেকে।

আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের আইন

আন্তর্জাতিক নদীর পানি নদী অববাহিকার দেশসমূহের সাধারণ সম্পত্তি। সে কারনেই এ পানি সম্পদের অধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং যৌক্তিক ব্যবস্থাপনার ওপর সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের ভূরাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক নদীর পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭২ সালের ১৫-১৬ জুন স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে একাধিক বৈধ কতৃত্ব সম্পর্কিত সমস্যা নিস্পত্তির লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করা হয় যে সংশ্লিষ্ট সরকারগণ একাধিক বৈধ কর্তৃত্বের পানি সম্পদের জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে পানি অববাহিকা কমিশন গঠনের বিষয় বিবেচনা করবেন।

১। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী প্রত্যেক দেশকে তার নিজস্ব সম্পদ উন্নয়নে স্থায়ী কর্তৃত্বের বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

২। রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা নিম্নের নীতিমালা যখন প্রযোজ্য হওয়া উচিত-

ক) জাতিগুলো একমত যে অন্য দেশের পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এমন কোন বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশকে কাজকর্ম শুরুর অনেক আগে তা জানিয়ে দিতে হবে।

খ) পরিবেশগত দিক থেকে সকল পানি সম্পদ ব্যবহার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানির দূষণ রোধ করা।

গ) একাধিক জাতীয় কর্তৃত্বের অন্তর্গত পানি সম্পদের সুফল সংশ্লিষ্ট জাতিগুলোর ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগ করে নিতে হবে।

৩। সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ যুক্তিসঙ্গত মনে করে এমন সব ব্যবস্থা যাতে আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রহণ করা যায়-

ক) পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যৌথভাবে তথ্য আহরণের কর্মসূচি গ্রহণ।

খ) বিদ্যমান পানি ব্যবহারে পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া নিরূপণ।

গ) মান নিয়ন্ত্রনের কর্মসূচিসহ পরিবেশের পক্ষে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে পানি সম্পদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার।

ঘ) পানির ব্যবহার ও দাবী রক্ষার্থে বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪। উপর্যুক্ত বিবেচনাগুলো বর্ধিত করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক সম্মেলন সংগঠন করা ।

বর্তমান বিশ্ব ক্ষুধা, দারিদ্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অধিক জনসংখ্যার ভারে উন্নয়নশীল দেশসমূহ ক্রমাবর্তনশীল। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর ভূখন্ডগত সম্পদ দ্রুত নি:শেষ হতে চলেছে। তাই সামুদ্রিক সম্পদ মানুষের কাছে দিন দিন আকর্ষনীয় হয়ে উঠছে। ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন সমুদ্রের ওপর তার অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সমুদ্রের এই বিশাল এলাকাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সীমানায় চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন-

১। সমুদ্র তটরেখা বা ভিত্তি রেখা (Base Line)

২। আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল (Territorial Sea)

৩। সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone)

৪। সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল (Contiguous Zone)

৫। মহীসোপান (Continental Shelf)

৬। উন্মুক্ত সমুদ্র অঞ্চল (High Sea)

সমুদ্র তটরেখা বা ভিত্তি রেখা (Base Line)

ভাটার সময় উপকূলের পানি যে শেষ প্রান্তে অবস্থান করে সে স্থান বরাবর কল্পিত রেখাকেই তটরেখা বলে। এ স্থান হতে উপকূলের সমুদ্র অঞ্চল পরিমাপ করা হয়।

আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল (Territorial Sea)

তটরেখা হতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে সমুদ্রের ওপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে। এ সমুদ্র অঞ্চলকেই আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল বলে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে এ দুরত্ব ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারণ করা হয়।

> সমুদ্র তটরেখা হতে সর্বোচ্চ ২০০ নটি ক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল বলে।

সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone)

১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে উপকূলীয় রাষ্ট্র সমুহকে সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অধিকার প্রদান করা হয়। এখানে উপকূলীয় রাষ্ট্রের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অধিকার থাকে। এটি তটরেখা হতে সর্বোচ্চ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল (Contiguous Zone)

আঞ্চলিক সমুদ্রের সংলগ্ন এলাকাকে উপকূলীয় রাষ্ট্রের সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল বলে। মাৎস্য শিকার সংক্রান্ত বিধি বিধান এবং চোরাচালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলের ধারনা প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে আঞ্চলিক সমুদ্র হতে গভীর সমুদ্রের পরবর্তী ১২ নটিক্যাল মাইল অর্থাৎ তটরেখা হতে ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চলকে সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল বলে অভিহিত করা হয়েছে। সংলগ্ন সমুদ্রের ওপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের আধিপত্য সুনিশ্চিত করার জন্য সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলকে মোট ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- শুল্ক অঞ্চল, স্বাস্থ্যকর অঞ্চল, অভিবাসন অঞ্চল এবং মৎস্য শিকার অঞ্চল।

মহীসোপান (Continental Shelf)

মহাদেশের কিছু অংশ সমুদ্রের পানির মধ্যে বিস্তৃত থাকে। এই অংশে সমুদ্রের গভীরতা কম থাকে। মহাদেশের এ অগভীর নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশনে সাধারণভাবে কোন কোন দেশ তটরেখা হতে সমুদ্র বক্ষে ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ২৫০০ মিটার গভীর সমুদ্র তলদেশ হতে ১০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত তার মহীসোপানকে বিস্তৃত করতে পারবে।

উন্মুক্ত সমুদ্র অঞ্চল (High Sea)

১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশন মতে কোন রাষ্ট্রের সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল, আঞ্চলিক সমুদ্র বা অভ্যন্তরীণ জলরাশি বা দ্বীপপুঞ্জ দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রে দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভূক্ত জলরাশির বাহিরের সমুদ্রাংশই উন্মুক্ত সমুদ্র। উন্মুক্ত সমুদ্র সমগ্র মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি।

অনুশীলনী (Activity) ঃ ধরুন মায়ানমারের একটি মাছ ধরার ট্রলার বঙ্গোপসাগরে মাছ আহরনকালে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে ১৭৫ নটিক্যাল মাইল ভিতরে চলে এসেছে সেক্ষেত্রে কোন আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে তা যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করুন।

সারমর্মঃ

আন্তর্জাতিক নদীর পানি নদী অববাহিকার দেশসমূহের সাধারণ সম্পত্তি। অধিক জনসংখ্যার ভারে উন্নয়নশীল দেশসমহের ভূখন্ডগত সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হতে চলেছে। তাই সামুদ্রিক সম্পদ মানুষের কাছে দিন দিন আকর্ষনীয় হয়ে উঠছে। সমুদ্রের এই বিশাল এলাকাকে সমুদ্র তটরেখা, আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল, সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল, সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল, মহীসোপান ও উন্মুক্ত সমুদ্র অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের সমুদ্র আইন কনভেনশন অনুযায়ী তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল হিসেবে নির্ধারন করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল তটরেখা থেকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত?
ক) ১২ নটিক্যাল মাইল
খ) ১৪ নটিক্যাল মাইল
গ) ১৬ নটিক্যাল মাইল
ঘ) ২০ নটিক্যাল মাইল

২। সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলকে মোট কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) ২ ভাগে
খ) ৩ ভাগে
গ) ৪ ভাগে
ঘ) ৫ ভাগে

৩। ভাটার সময় উপকূলের পানি যে প্রান্তে অবস্থান করে সে স্থান বরাবর কল্পিত রেখাকে কী বলা হয়?
ক) ১৫৫০ মিটার
খ) ২০৮৬ মিটার
গ) ২৫৮৬ মিটার
ঘ) ৩২৮৪ মিটার

৪। তটরেখা হতে একটি নির্দিষ্ট দুরত্বে সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের যে সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে সেই সমুদ্র অঞ্চলকে কী বলা হয়?
ক) সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল
খ) আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল
গ) সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল
ঘ) উন্মুক্ত সমুদ্র অঞ্চল

উত্তরমালা: **১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ**

চূড়ান্ত মূল্যায়ন -ইউনিট-২৫

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। মৎস্য আইন বলতে কী বোঝায়? মৎস্য আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২। মৎস্য আইনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
৩। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বলতে কী বোঝায়? এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো সংক্ষেপে লিখুন।
৪। সামুদ্রিক মৎস্য আইন ১৯৮৩ বলতে কী বোঝায়? এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে লিখুন।
৫। মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ লিখুন।
৬। মৎস্য সংরক্ষণ আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট মতামত দিন।
৭। আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহারের আইন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৮। আঞ্চলিক সমূদ্র অঞ্চল ও সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৯। মহীসোপান বলতে কী বোঝায়?
১০। সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল ও উন্মুক্ত সমূদ্র অঞ্চল বলতে কী বোঝায়?